

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে
দেশী জাতের আমন ধান
চাষের সমস্যা ও সম্ভাবনা



উত্তরণ

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে

দেশী জাতের আমন ধান চাষের সমস্যা ও সম্ভাবনা

নির্দেশনায়
শহিদুল ইসলাম

সম্পাদনায়
সুধাশঙ্কু কুমার সরকার
ওবায়দুল হক পলাশ
মোঃ বদিউজ্জামান

কৃতজ্ঞতায়
সরদার আবু ইউসুপ
আলী আহমেদ আকুঞ্জী
আঃ বারী সরদার



উত্তরণ

নির্দেশনায় :

শহিদুল ইসলাম

সম্পাদনায় :

সুধাংশু কুমার সরকার

ওবায়দুল হক পলাশ

মোঃ বদিউজ্জামান

প্রকাশনা :

রিসার্চ এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল

উত্তরণ

জুন ২০০৯

যোগাযোগ :

উত্তরণ

৪২, সাত মসজিদ রোড (চতুর্থ তলা)

ধানমন্ডি, ঢাকা -১২০৯, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮-০২-৯১২২৩০২

ই-মেইল : uttaran@bdonline.com

Website : <http://www.uttaran.org>

প্রচন্দ : শেখর কুমার বিশ্বাস

অংকুর, খুলনা

ডিজাইন :

এস. আকাশ-অংকুর, ৪৪, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা। ০৮১-৮১৩৮৬০

মুদ্রণ : প্রচারণী প্রিণ্টিং প্রেস

৪৪, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা। ০৮১-৮১০৫৯৭

মুখ্যবন্ধ

বাংলাদেশ নদ-নদীর দেশ। সমগ্র দেশের একটি বড় অংশ উপকূলীয় অংশে সংযুক্ত। এমনিতে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ একটি দেশ। প্রতি বছর বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গন, ভূমিক্ষস, জলোচ্ছাস, সাইক্লোন, জলাবদ্ধতা, টর্নেডোসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ তাগ মানুষ আক্রান্ত হয়। এর ফলে একদিকে যেমন দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় অন্যদিকে দারিদ্র্যতার প্রকট গ্রাসে মানুষের জীবন হয়ে পড়ে দৰ্শিসহ।

স্বাধীনতার পর থেকে এপর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে যা ক্ষতি হয়েছে তা মোট জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশ। সুতরাং এহেন ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করা একদিকে যেমন সহজসাধ্য বিষয় নয়, তেমনি-বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে বিশাল জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী পর্যাণ সেবা প্রদান করা সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার পক্ষে কঠকর। উত্তরণ মানুষের ক্ষমতায় বিশ্বাস করে তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের মানবিক ক্ষমতার বিকাশ সাধনে কাজ করে যাচ্ছে। মানুষ অতিরিক্ত ফসল ফলানোর জন্য হাইব্রিড সহ উচ্চফলনশীল ধান চাষে অভ্যন্ত হয়ে পড়ছে। কিন্তু এদেশের কৃষকদের বৎশ পরম্পরায় স্থজ্ঞানের মাধ্যমে জমিতে দেশী জাতের বিভিন্ন ধরনের ধান চাষ করার অভিজ্ঞতা আছে। এ সকল ধানের মধ্যে- পঞ্জিরাজ, জলকুমারী, মধুমালা, জলকাদা, খেজুরবুপি, তুলসিমালা, জামাইপাগল, হরিশংকর, মাছরাঙা, গঙ্গাজল, কটকতারা, ব্যাত, কালজিরা, কালবরঙ্গই, ঢাপো, বালাম, মনোহর প্রভৃতি হরেকরকম দেশী জাতের ধান খরা, বন্যা, শীত, লবনসহ নানা বিরুদ্ধপ প্রাকৃতিক পরিবেশে সহ্য করার ক্ষমতা এ সব ধানের ছিল।

দেশের উপকূলীয় এলাকা, বন্যা কবলীত ও হাওড় এলাকায় নিয়মিত দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য স্থানীয় এনজিওদের মাধ্যমে মিজোরিও-জার্মানী কাজ করে যাচ্ছে। উত্তরণ মিজোরিও-জার্মানীর সহযোগিতায় সাতক্ষীরা অঞ্চলে দেশী জাতের ধান চাষ ও সম্প্রসারনের জন্য কৃষকদের সংগঠিত করে আসছে। কৃষকদের ব্যাপক সাড়া পাওয়ার পর কৃষক সংগঠন তৈরী করে তাদের প্রশিক্ষণ ও ধান চাষের জন্য এ ধরনের একটি বুকলেট তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করে।

আমার বিশ্বাস এ ধরনের প্রকাশনার মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষক ভাইয়েরা তাদের হারিয়ে যাওয়া ধান আবার ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন এবং তাদের আর বীজ ধানের জন্য ঠকতে হবে না। মিজোরিও-জার্মানী এর প্রতি উত্তরণের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কারণ তাদের সহযোগিতার জন্যই এ অঞ্চলে দেশী জাতের ধান চাষের প্রেরনা যোগাচ্ছে।

শহিদুল ইসলাম

পরিচালক

জুন ২০০৯

পটভূমি

পদ্মা মেঘনা যমুনা নদীর খরস্নোতা পললভূমি দিয়ে গঠিত বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্ধীপ। এসব নদীর অববাহিকা দিয়ে ধীরে ধীরে জনবসতী গড়ে ওঠে। বেঁচে থাকার জন্য তাই মানুষের প্রয়োজন হয়ে পড়ে থাদ্য। বাংলাদেশে কৃষিকাজের মাধ্যমে থাদ্য উৎপাদন অন্যতম নিয়ামক হয়ে উঠল। কৃষির মধ্যে ধান বাংলাদেশের সবথেকে বেশী উৎপাদিত ফসল। এ দেশের কৃষকরা যুগ যুগ ধরে নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মিশ্রন ঘটিয়ে ধান চাষ করে পরিবারের সকল চাহিদা মেটাতো।

বাংলাদেশে অতি প্রাচীন কাল হতে ধান চাষের শুরু হয়েছে। প্রায় ৩৫০০ বছর পূর্বে আর্যরা তাদের জীবিকার সন্ধানে সুদূর ককেশাস অঞ্চল হতে এদেশে আসে। আর্যদের মধ্যে “আলপিনো” নামক একটি গোষ্ঠি সিঙ্গু নদের অববাহিকা হয়ে উর্বর পলল ভূমির খোঁজে সেই সময়ে এ অঞ্চলে বসবাসরত আদি বাসিন্দা দ্রাবিড়দের সঙ্গে মিশে গিয়ে কৃষিকাজের জন্য পরম্পর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মিশ্রন ঘটিয়ে কৃষিকাজ শুরু করে। শুরু হয় ধান উৎপাদন। কারন এ অঞ্চলের ভূমি ছিল নদীবাহিত পলল দিয়ে গঠিত উর্বর মাটি। এ মাটিতে বীজ ছিটালেই অতি সহজে ধান জন্মাতে পারে। সেই বহু যুগ পূর্ব হতে এ অঞ্চলে প্রতিটি বাড়ীতে দেখা যেত গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু ও পুকুর ভরা মাছ। সেই সময় হতে চাষীরা বিনা খরচে দেশী জাতের বিভিন্ন প্রকার ধান চাষ করতো এবং প্রচুর পরিমাণে বছরশেষে গোলাভরে ধান রাখতো। প্রায় ১০,০০০ দেশী জাতের ধান এ অঞ্চলের কৃষকরা চাষ করতো। এ সকল ধানের মধ্যে- পঞ্জিরাজ, জলকুমারী, মধুমালা, জলকাদা, খেজুরবুপি, তুলসিমালা, জামাইপাগল, হরিশঙ্ক, মাছরাঙা, গঙ্গাজল, কটকতারা, ব্যাত, কালজিরা, কালবরুই, ঢাপো, বালাম, মনোহর প্রভৃতি হরেকরকম দেশী জাতের ধান খরা বন্যা শীত লবন সহ নানা বিরুপ প্রাকৃতিক পরিবেশে সহ্য করার ক্ষমতা এ সব ধানের আছে। বহু কাল হতে এ সব জাতের ধান মানুষের হাসি-কান্না সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে আবহমান কালের সংস্কৃতির অংশ হয়ে এ দেশের কৃষকের মনে আলোকিত হয়ে আছে। ধান কাটার সময়ে মানুষ উৎসব করে ধান ঘরে তুলতো এবং সংযতে ধান বীজ সংরক্ষণ করতো। তাছাড়া সময় ও ঘটনা ভেদে তারা পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে এ সব ধানের চাল থেকে হরেকরকম উপাদেয় থাদ্য তৈরী করতো। যেমন পার্বনের সময় কোন ধানের চাল লাগবে বা বাড়ীতে আত্মায়-স্বজন আসলে কোন ধানের চাল দিয়ে পোলাও, বিরিয়ানি বা পিঠা পায়েস তৈরী হবে সেটা বলাবাহ্য। গ্রামের এই প্রবাহমান উৎসব মুখর পরিবেশ আমাদের লোকজ সংস্কৃতির অংশ হয়ে-মানুষ বৎশ পরম্পরায় মনের মধ্যে লালন করে আসছে।

কিন্তু বাস্তবতা আজ অতি কষ্টের ও বেদনার - আমাদের এই অঞ্চলের সেই প্রিয় চির চেনা দেশী জাতের আউশ ও আমন ধান হারিয়ে যেতে বসেছে। হাজার হাজার বছর ধরে বাপ দাদাদের রেখে যাওয়া সম্পদ আজকে প্রায় ধ্বংসের পথে। বিলুপ্তি হয়ে গেছে হাজার হাজার জাতের দেশী জাতের ধান। এই প্রজন্মের চাষীরা জানেই না যে আমাদের এই দেশে পূর্বপুরুষরা এই মাটিতেই প্রায় ১০,০০০ এর উপর দেশী জাতের ধান চাষ করতো। এখনও পর্যন্ত যে কয়টি জাত অবহেলায় অবশিষ্ট আছে সকলে মিলে সচেষ্ট হলে সেগুলো রক্ষা করা যাবে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সাধারণতও ৩৩ মৌসুমে ধান উৎপাদন হয়ে থাকে-আউশ, আমন এবং বোরো। তাছাড়া এই এলাকার ফসলী জমি সমূহকে ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমমত: মিষ্টি পানি নির্ভরশীল এলাকা দ্বিতীয়ত: দ্বিতীয় লবন পানি নির্ভরশীল এলাকা। এ দ্বটো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এলাকা সমূহের ফসল উৎপাদনের কোশল, ধানের প্রজাতি ও সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন।

মিষ্টি পানি নির্ভরশীল এলাকায়

মিষ্টি পানি নির্ভরশীল এলাকায় তিন মৌসুমে যথা আউশ, আমন ও বোরো ধান উৎপাদন হয়ে থাকে। বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল ধানের জাতের প্রচলন ও সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে বোরো মৌসুমে প্রচুর ধান উৎপাদন হয়। তাছাড়া আমন মৌসুমেও ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে আউশ মৌসুমে ধানের উৎপাদন অনেক কমে গেছে এবং গভীর বিল এলাকায় যেখানে আগে ধান চাষ হতো সেখানেও ধানের উৎপাদন কমে গেছে। অধিকন্তু উপকূলীয় জলাভূমি এলাকায় ধানের উৎপাদন মাত্রাত্তিক্রম হাস পেয়েছে। কারণ

আমন মৌসুম:

ইতোপূর্বে দেশীয় প্রজাতির আমন ধান ছিল যা সাধারণত: ৭/৮ ফুট বা ৮/৯ ফুট পানির মধ্যে জন্মাতে পারতো এবং কৃষকেরা এসকল ধানের চাষ করতো। এসব ধান সাধারণত চৈত্র-বৈশাখ মাসে কৃষকেরা বুনতো এবং পৌষ মাসে কৃষকেরা ফসল ঘরে তুলতো। তাই এসব প্রজাতির ধান উৎপাদন করতে সাধারণত ৮/১০ মাস সময় লাগে। কিন্তু বোরো মৌসুমে ব্যাপক উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের প্রেক্ষিতে আমন মৌসুমে দেশীয় প্রজাতির ধানের উৎপাদন কমে গেছে। কারণ পৌষ-মাঘ মাসে কৃষকেরা এসকল নীচু জলাভূমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ করে এবং বৈশাখ মাসে ফসল কেটে থাকে। তাই বোনা আমন ধান চাষ করা কৃষকের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে বছরে সাধারণত কৃষকেরা ১টি ফসলই পায় এবং আমন মৌসুমে এসকল নীচু জলাভূমিতে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে।

দ্বিতীয় লবণ-পানি নির্ভরশীল এলাকা

দ্বিতীয় লবণ-পানি সহনশীল এলাকায় ঘাটের দশকে সরকার উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ করে মিষ্টি পানি এলাকায় রূপান্তর করার প্রচেষ্টা চালায় যা বর্তমানে ব্যাপক পরিবেশ

বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঁধের ফলে জীব-বৈচিত্রের ছন্দ-পতন ঘটেছে, দেশী প্রজাতির অনেক প্রকার ধানের বিলুপ্তি ঘটেছে, জোয়ার-ভাঁটা প্রাবন ভূমির পরিমাণ সংকুচিত হওয়ার ফলে জোয়ার-ভাঁটার তীব্রতা হাস পেয়েছে এবং এরফলে প্রাবন ভূমিতে পলি অবক্ষেপিত না হতে পেরে মৃত প্রায় নদীসমূহে পলি অবক্ষেপিত হয়েই নদীগুলোকে ভরাট করে ফেলেছে, যা সৃষ্টি করছে ব্যাপক জলাবদ্ধতা। তাছাড়া যে বাঁধ লবণাক্ততা দূর করার জন্যে নির্মাণ করা হয়েছিল সেই বাঁধের অভ্যন্তরে শুক মৌসুমে বৈশিক প্রক্রিয়ায় চিংড়ি চাষের সম্প্রসারণ হওয়ার প্রেক্ষিতে লবণাক্ততার পরিমাণ মোটেও কমেনি বরং বৃদ্ধি পেছে। তাই ঈষৎ লবণ-পানি নির্ভরশীল উপকূলীয় জলাভূমিতে বাঁধের মাধ্যমে মিষ্টি পানি নির্ভরশীল উচ্চ ফলনশীল ধানের জাতের প্রচলন যেমন সম্ভব হয়নি তেমনি দেশী প্রজাতির ঈষৎ লবণ-পানি সহনশীল অনেক ধানের বিলুপ্তি ঘটেছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন তো বাড়েনি বারং তা যথেষ্ট পরিমাণ কমে গেছে। উল্লেখ্য উপকূলীয় জলাভূমিতে আমন ধানেরই চাষ হয়ে থকে। যদিও বাঁধ নির্মাণের পরপরই কিছু এলাকাতে উচ্চ ফলনশীল জাতের আমন ধান বা আউশ ধানের প্রচলনের চেষ্টা হয়েছিল তবে তা কার্যকর হয়নি।

বর্তমানে দেশী আমন ধানের অবস্থা:

পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বাংলার কৃষক সমাজ আজ এক মহা সঙ্কিষ্টনের মধ্যে অবস্থান করছে। অতিরিক্ত ফলন পাওয়ার আশায় কৃষকরা নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে পাশ কাটিয়ে বিদেশী বেনিয়াদের চাপিয়ে দেয়া ধারনা থেকে আলোড়িত হয়ে অতি উৎসাহে জমিতে এখন উচ্চফলনশীল জাতের ধান চাষ শুরু করেছে। তাই এখন আর দেখা যায় না চৈত্র মাসের শেষে প্রথম বৃষ্টিতে এবং বৈশাখ মাসের শুরুতে সারি সারি কৃষকের কাধে লাঙ্গল-জোয়াল, মাথায় ধান বীজের ধামা-খুচি, আইলে বসে কৃষকদের আজ ছুকোতে তামুক টানার মধ্য দিয়ে নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা ভাগকরে নেওয়ার দৃশ্য আজ শুধু স্মৃতি। গ্রাম বাংলা থেকে বেশ আগে থেকেই এসব হারিয়ে গেছে। এখন আর জমিতে চাষ শেষ হওয়ার সংগে এক সাথে হৈ হৈ রবে বীজ ধান ছিটানোর কোন আওয়াজ কারো কানে পৌছায় না। উচ্চফলনশীল (HYV) জাতের ধান চাষের জন্য এখন কৃষকরা ব্যবহার করছে পাওয়ার টিলার, ট্রাকটর, শ্যালোমেশিন, ধানবাড়ার মেশিনসহ আরও অনেক যান্ত্রিক উপকরণ যা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ।

বিলের নীচু অংশ যেখানে ৭/৮ ফুট পানি থাকত সেখানে দেশী জাতের আমন ধান খুব ভাল হতো এবং আমাদের এই এলাকার বিলে হরিশঙ্ক, মাছুরাঙ্গা, গঙ্গাজল প্রভৃতি দেশী জাতের ধান খুব ভাল হতো। কিন্তু বর্তমানে আমাদের

এই সকল বিলের নিচু অংশের জমিতে চিংড়ী চাষ, সাদা মাছ চাষ হওয়ার ফলে আমন ধানের জমি অনেকাংশে কমে যাচ্ছে। আর জমির উচু অংশে উচ্চফলনশীল (HYV) রোপা আমন এবং বিভিন্ন প্রকার হাইব্রিড জাতের ধান চাষ হচ্ছে। আর্থজ্ঞাতিক ধান গবেষনা ইনিস্টিউট (IRRI) ও বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনিস্টিউট (BRRI) উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল (HYV) আমন ধান বাংলাদেশের এ সব জমি দখল করে নিয়েছে। উচ্চফলনশীল (HYV) জাতের মধ্যে BR-11, BR-10, BR-30, BR-31, BR-32, BR-33, BR-34, BR-37, BR-38, BR-39, BR-40, BR-41, BR-44, BR-46, বিনাধান-8, বিনাশাইল, সোনার বাংলা-১, সোনার বাংলা-৬ (হাইব্রিড) প্রভৃতি ধানের চাষ করতে কৃষকরা এখন অভ্যন্ত। এই ধানের বীজ বি.এ.ডি.সি এর মাধ্যমে শুনাগুন পরিক্ষিত হওয়ার পর চাষ করার জন্য বাজারজাত করা হয়। এ সকল ধান চাষের জন্য সঠিক ভাবে চাষ পদ্ধতি অনুসরন করতে হয়। এছাড়া অনুমোদিত কিছু দেশী ও বিদেশী বীজ কোম্পানি যেমন Cynzenta, Ciba-Gaigy, Global Agrovate, ACI দের বীজ চাষীরা বেশী ফলনের লোভে চাষ করে যাচ্ছে। চাষী ও শংশুষ্ঠি কৃষি সেক্টর এর অভিজ্ঞ পরামর্শক এবং এই সকল কোম্পানির মতে-

- উচ্চফলনশীল ধান বিশেষ করে হাইব্রিড জাতের ধান ১ শতকে ১ মন ধান উৎপাদিত হয়।
- উচ্চফলনশীল এ সকল ধানের ফলন বেশী হওয়ায় অধিক লাভ হয়।
- সম্ভল সময়ে মধ্যে ফসল ঘরে উঠানে সম্ভব।
- বেশী ফলন হওয়ার কারনে দেশের খাদ্য চাহিদা অনেকাংশে কমে যাবে।
- অধিক ফলন হওয়ার কারনে দারিদ্র্য বিমোচন সহ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

উচ্চফলনশীল জাতের পাশাপাশি বাংলাদেশে ১৯৯৮ সাল হতে কৃষকরা হাইব্রিড জাতের বীজ ধানের সংগে পরিচিত হতে শুরু করল। দেশী ও বিদেশী কিছু কোম্পানি হাইব্রিড বীজ ধান তখন বিদেশ থেকে আমদানী করা শুরু করল। এর মধ্যে সোনারবাংলা-১, সোনারবাংলা-৬,(রোপা আমন) আলোক, লোকনাত, অমর, আলোড়ণ(বোর) প্রভৃতি জাতের হাইব্রিড ধান কৃষকরা ব্যাপকভাবে চাষ করা শুরু করল। ২০০৮ সালে ৩৫০০ মে.টন হাইব্রিড ধান বীজ আমদানি করা হয়। ব্রাক, ACI, আফতাব, সুপ্রিম সিড, লাল তীর প্রভৃতি কোম্পানি এ ধরনের বীজ বাজারজাত করে থাকে। এ সকল কোম্পানির দাবি এ জাতের ধান চাষ করে বাংলাদেশে ৮-১০ লক্ষ মে.ট পর্যন্ত ধানের ফলন বৃদ্ধি ঘটেছে (প্রথম আলো ১৮/০৫/০৮)।

উচ্চফলনশীল ধান চাষের উৎপাদন খরচঃ

১ বিঘা জমিতে BR-11 বা এ ধরনের উচ্চফলনশীল জাতের আমন ধান রোপন করতে যে পরিমাণ মূলধন ও সময় এর প্রয়োজন সেটা নিম্নে দেওয়া হলো-

ক্রঃ	বিবরণ	পরিমাণ	হার	টাকা
১	বীজতলার জমি চাষ (প্রস্তুত) করা	১ বার	২০০	২০০
২	বীজ ধান ক্রয়	৮ কেজি	২৫	২০০
৩	বীজতলাতে চারা পরিচর্যা			১০০
৪	এক বিঘা জমি চাষ	৩ বার	২০০	৬০০
৫	ঘাস বাছাই	৩ জন	১০০	৩০০
৬	চারা উঠানো ও রোপন জন(শ্রমিক) খরচ	৫ জন	১০০	৫০০
৭	জমিতে প্রয়োজনীয় পানি সেচ			৫০০
৮	সার ও কীটনাশক প্রয়োগ			১১০০
৯	আগাছা নিড়ানী	৩ জন	১০০	৩০০
১০	ধান কাটা ও বিছালী বাধা	৭ জন	১০০	৭০০
১১	ধান ঝাড়া (মেশিনে)	২ জন	১০০	২০০
	মোট			৮৭০০/-

ফলন : ১ বিঘাতে ১৪/১৬ মন।

আয় : ১৬ মন ধানের বাজার মূল্য ৮০০০/- ও পল/খড়ের মূল্য ৮০০/-

নেট লাভ : ৪০০০/-টাকা।

কেন এ অবস্থা সৃষ্টি হলো ?

বাংলাদেশে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত দেশের ৯৫ শতাংশ জমিতে দেশী জাতের ধান চাষ হতো। কিন্তু এর পর থেকে কৃষকরা বেশী ফলনের আশায় বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানির লোভনীয় ও আকর্ষণীয় প্রচারের দিকে ঝুকে পড়লো। এবং শুরু হলো কৃষি নিয়ে নতুন খেলা। আর এ খেলায় নির্মম শিকার হলো এদেশের সহজ সরল কৃষকরা আর লাভবান হলো বহুজাতিক কোম্পানির এজেন্টরা। কারন চাষীরা আজ জমিতে চাষ দেয়ার আগে উচ্চফলনশীল (HYV) জাতের ভাল বীজ খেঁজার জন্য পাগল হয়ে যায়। অথচ একসময়ে আমাদের চাষীদের ঘরে বীজের ভান্ডার ছিল। আমাদের ঘরের ধান থেকে বীজ বের করে যত্ন করে সংরক্ষন করতেন। তখন প্রত্যেকের ঘরে বীজ ধান মজুত থাকতো। বহুজাতিক কোম্পানির এসব বীজ থেকে যে ধান উৎপন্ন হয়

পরবর্তীতে তা আর বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। আর করলেও তার ফলন ভয়ানক খারাপ হয়। তাছাড়া এ সব বীজ খুবই স্পর্শকাতর কারণ সঠিক নিয়ম মেনে চাষ করতে হয় যা আমাদের দেশের কৃষকরা সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে না। যেমন-পরিমানমত পানি সরবরাহ, পরিমানমত রাসায়নিক সার প্রয়োগ এবং কীটনাশক প্রয়োগের সমন্বয় সাধন যা আমাদের কৃষকরা করতে সক্ষম হয় না। ফলে ফলনও আশানুরূপ হয় না। বাংলাদেশে ৮০ দশক থেকে উচ্চফলনশীল(HYV) জাতের ধান চাষ ব্যাপকভাবে প্রসার ঘটেছে। এবং এ জন্য কৃষকরা বীজ ধানের জন্য ঐ সব কোম্পানির কাছে ধরনা দিতে বাধ্য হয় কারণ এখন কৃষকদের ঘরে নিজস্ব কোন বীজ ধান নেই। বীজ চলে গেছে বিদেশী বেনিয়াদের হাতে। তারা যে দামে বীজ ধানের মূল্য নির্ধারণ করবে আজ কৃষকদের সেই চড়া দামে বীজ ধান ক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে। শুধু তাই নয় উচ্চফলনশীল (HYV) এ বীজ ধান চাষের জন্য আনুসংগিক যে সব উপকরণ লাগে তাও তাদের নিকট থেকে ক্রয় করতে হয়। ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কৃষকদের আজ পুরোপুরি বিদেশী কোম্পানির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে এবং চাষের জন্য অতিরিক্ত উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও কৃষকরা অধিক ফলনের লোভে জমিতে বেশী মূলধন বিনিয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছে। উচ্চফলনশীল জাতের ব্যাপক প্রসারনের কারনে বর্তমানে দেশের মাত্র ৫ শতাংশ পরিমান জমিতে দেশী জাতের ধান চাষ হচ্ছে।

দেশী জাতের আমন ধান চাষের সম্ভাবনা ৪

উচ্চফলনশীল (HYV) জাতের ধান চাষের প্রথম দিকে কৃষকরা সুফল পেলেও ধীরে ধীরে এ সকল ধানের ফলন কমতে শুরু করলো কারণ-

- এই জাত তৈরী হয় দুটি ভিন্ন ভিন্ন গুনসম্পন্ন জাতের সংকরায়নের মাধ্যমে।
- দীর্ঘদিন ধরে এই সংকরায়ন প্রক্রিয়া চলতে থাকে যা কমপক্ষে ৬-৭ বার পর্যন্ত হয়।
- উচ্চফলনশীল জাতগুলো এমনভাবে তৈরী যা অধিক সার প্রহন করে দ্রুত বাঢ়তে পারে।
- কিন্তু বাস্তবে এই সংকরায়নের ফলে যে গুনাগুন সম্পন্ন নতুন জাতটিতে তৈরী হয় তা দীর্ঘদিন ধরে রাখা যায় না।
- তাই প্রথম পর্যায়ে বেশী ফলন হলেও পরবর্তীতে এর ফলন কমতে শুরু করে।
- ধান থেকে বীজ রাখলে ফলন কমে যায়।

ବ୍ରି-ର ମହାପରିଚାଳକ ଡ.ମୋ.ନୂର-ଇ-ଏଲାହୀ ବଲେନ-ଉଚ୍ଚଫଳନଶୀଳ (HYV) ଜାତେର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହଛେ ଏର ଫଳନ ପ୍ରତିବହ୍ର କମେ ଯାଇ । ଏ କାରନେ ତିନ ବହୁ ପର ପର ବି.ଏ.ଡି.ସି ଥିକେ ନତୁନ ବୀଜ କିନେ ତା ଜମିତେ ରୋପନ କରାର ପରାମର୍ଶ ଦେନ (ପ୍ରଥମ ଆଲୋ ୧୭/୦୫/୦୮) ।

ଉଚ୍ଚଫଳନଶୀଳ ଓ ହାଇବ୍ରିଡ ଧାନ ଚାଷେ ଏକଦିକେ କୃଷକରା ଯେମନ ବୀଜ କୋମ୍ପାନିର ଉପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୟେ ପଡ଼ିଛେ ଅନ୍ୟଦିକେ ମାଟି ଓ ପରିବେଶେର ଉପର ଏର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହଛେ । ଏସବ ଜାତେର ଧାନ ଚାଷେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେ ପରିମାଣେ ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ, ଭୂ-ଗର୍ଭସ୍ଥ ପାନି ବ୍ୟବହାର କରତେ ହୁଏ ଏବଂ ଏର ଜନ୍ୟ କୃଷକଦେର ପ୍ରତ୍ୟେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟଯ କରତେ ହୁଏ । ତାହାଡ଼ା କୁନ୍ଦ ଓ ପ୍ରାଣିକ ଚାଷୀରା ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରତେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ନା । ଏମନିକି ଅନେକସମୟ ଏହି ଅର୍ଥ ଯୋଗାନୋର ଜନ୍ୟ ଏହି ସବ କୁନ୍ଦ ଚାଷୀରା ମହାଜନେର କାହିଁ ଥିକେ ଚାଷେର ସମୟ ଦାଦନେ ଆଗାମ ଅର୍ଥ ଝନ ଗ୍ରହନ କରେ । ଅନେକ ସମୟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଗେର କାରନେ ଚାଷୀରା ତାଦେର କାଞ୍ଚିତ ଫସଲ ଘରେ ତୁଳତେ ପାରେ ନା । ମହାଜନେର ଦାଦନେର ଟାକା ପରିଶୋଧେର ଚାପେ ଚାଷୀରା ତାଦେର କୁନ୍ଦ ଜମିଟିକୁ ମହାଜନେର ନିକଟ ବନ୍ଦକ ଦିତେ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ । ତାହାଡ଼ା ଉଚ୍ଚଫଳନଶୀଳ ଓ ହାଇବ୍ରିଡ ଧାନ ଚାଷେର ଫଳେ-

- ବୀଜ ଧାନେର ଜନ୍ୟ କୃଷକରା ବୀଜ କୋମ୍ପାନିର ଉପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୟେ ପଡ଼ିଛେ ।
- ଜମି ଚାଷ ଓ ପରିଚର୍ୟାର ଜନ୍ୟ ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ପାନିର ବ୍ୟବହାର ବେଡ଼େ ଗେଛେ ।
- ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ପାନିର ବ୍ୟବହାରେର କାରନେ ପାନିତେ ଆର୍ସେନିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତବ ପଦାର୍ଥେର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚେ ।
- ଜୈବ ସାରେର ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାସାୟନିକ ସାରେର ମାଆତିରିକ ବ୍ୟବହାର ବେଡ଼େ ଗେଛେ ।
- ଅଧିକ ପରିମାଣେ ରାସାୟନିକ ସାରେର ବ୍ୟବହାରେର ଫଳେ ଜମିର ସ୍ଵାଭାବିକ ଉର୍ବରାଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୟେ ଯାଞ୍ଚେ ।
- ପ୍ରତି ବହୁ ଦେଶେ ପ୍ରାୟ ୮୦୦୦ ମେଟନ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହତ ହଛେ ।
- କୃଷି ଜମିତେ ଏତ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାରେର ଫଳେ ଜଲଜ ଜୀବ-ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଆଜ ହମକିର ସମ୍ମୁଖିନ ।
- ଏନଙ୍ଗ୍ରିନ, ହେନ୍ଟାକ୍ଲୋର, ଡିଡିଟି, ରିପକର୍ଡ, ସିମବୁଶ ଇତ୍ୟାଦି ଜାତୀୟ କୀଟନାଶକ ମାଛେର ଜନ୍ୟ ଚରମ ବିଷାକ୍ତ ।
- ଏ ସକଳ କୀଟନାଶକ ନୀଚୁ ଏଲାକାର ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗେର ସାଥେ ସାଥେ ଓଇ ସ୍ଥାନସହ ପାର୍ଶ୍ଵବତୀ ଏଲାକାଯ ଅବସ୍ଥାନରତ ମାଛେର ସାଥେ ସାଥେଇ ମାଛ ମାରା ଯାଇ ।

কিন্তু দেশী জাতের আমন ধানের ফলন তুলনামূলকভাবে একটু কম হলেও এটা পরিবেশের সংগে মানানসই এমনকি প্রতিকূল পরিবেশেও দেশী জাতের আমন ধান বেড়ে উঠতে পারে তাছাড়া এ ধানের জন্য জমিতে তেমন সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করা লাগে না ।

বাংলাদেশের কৃষকরা বহু কাল পূর্ব হতে পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে নিজেদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেশী জাতের ধান চাষ সফল ভাবে করে এসেছে । দেশী জাতের ধান চাষের জন্য বলতে গেলে অতিরিক্ত কোন অর্থের প্রয়োজন হয় না । বীজ ধানের জন্য তাকে কোম্পানির নিকট ধরনা দিতে হয় না । কারণ চাষীরা উৎপাদিত ধান থেকে নিজেরাই বীজ ধান বাছাই করতে পারে । বাড়ীতে মহিলারা নিজেরা বীজ সংরক্ষন করতে পারে । আমাদের এ অঞ্চলের জমিতে দেশী আমন জাতের যে সকল ধান ভাল হয় তন্মধ্যে হরিশঙ্ক, মাছরাঙ্গা, গঙ্গাজল অন্যতম । এ সব জাতের ধান এ অঞ্চলের মাটি ও পরিবেশের সংগে বহু যুগ আগে থেকে খাপখাইয়ে আসেছে । আমাদের পূর্বপুরুষরা যে ভাবে ধানের বীজ সংরক্ষন করতেন ঠিক সেভাবেই বংশপ্ররম্পরায় কৃষকরা এখনও ধানের বীজ সংরক্ষন, চারা তৈরী, জমি প্রস্তুত, পরিচর্যা, ধান কাটা থেকে মলা পর্যন্ত কৃষকরা দেশী জাতের আমন ধান চাষ করে ভাল ফল পাচ্ছে । এ সকল দেশী জাতের আমন ধান যা হাজার বছর ধরে কৃষকরা আমাদের এই এলাকার বিলে চাষ করে যাচ্ছে । এ জাতের ধান তিনি ভাবে চাষ করা যায় -

জাতের নাম : হরিশঙ্ক

রং : খোসা খয়েরী লাল, আকৃতি-পেট মোটা এবং চাল সাদা ।

গন্ধঃ স্বাভাবিক

জমির ধরন : নীচু জমি যেখানে ৭/৮ মাস পর্যন্ত পানি থাকে এবং পানির উচ্চতা ৫/৭ ফুট পর্যন্ত এ ধান হতে পারে এবং মধ্যম ও একটু উচু জমিতেও হরিশঙ্ক ধান নিম্নভোগ পদ্ধতিতে চাষ করা যায় ।

চাষ পদ্ধতিঃ

ক) বোনা (ছিটানো)

খ) গাছড়া

গ) পাতা

ক) বোনা (ছিটানোর) মাধ্যমে চাষ পদ্ধতিঃ

- চৈত্র মাসের জো বৃষ্টিতে ১ এক বিঘা জমিতে লাঙল দিয়ে ২/৩ বার চাষ দিতে হবে ।
- বৈশাখ মাসের প্রথম বৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত চমা জমি ফেলে রাখতে হবে ।
- বৈশাখ মাসের জো বৃষ্টিতে বীজ ধান (শুকনো) ঐ জমিতে ছিটিয়ে বুনতে হবে ।

- বীজ ধান ছিটানোর পর ঐ জমি দোয়াড় (দুই) চাষ দিতে হবে এবং ৩/৪ বার বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- ১ (এক) দিন পর জমি আবার ৩/৪ বার ভাল করে বাসই (মই) দিতে হবে।
- ১০/১৫ দিন পর চারা গজানোর পর দেখতে হবে যদি ঘন পরিমাণে চারা জন্মায় তাহলে কিছু পাতলা করে দিতে হবে।
- অনেক সময় এই চারা গাছড়া হিসেবে অন্য জমিতে রোপন করা যেতে পারে।

পরিচর্যাঃ

ধানের চারা গজানোর ১/২ মাসের মধ্যে ঝরা/আগাছা মেরে ফেলতে হবে। অনেক সময় পানিতে ভেসে আসা হাওজা (কচুরীপানা) আসলে পরিষ্কার করে দিতে হয়।

ধান কাটার সময়ঃ

কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে ধান ফোলা শুরু হয় এবং অগ্রহায়ন মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত ধান ফুলতে থাকে। এরপর অগ্রহায়ন মাসের শেষের দিকে ধান পাকা শেষ হয়। পৌষের শুরুতে ধান কাটা শুরু হয়।

ফলনঃ ১ বিঘাতে ৭/৮ মন।

বীজ সংরক্ষন পদ্ধতিঃ

- জমির যে অংশের ধান ভাল সেই অংশ ৩/৪ দিন জমিতে ধান কাটার পর রাখতে হবে।
- ধান কাটার পর বীজ ধান রাখার জন্য আলাদা করে ধান বাছাই করতে হবে।
- বাছাইকৃত ধান পা দিয়ে ডলে ভাল করে বেড়ে রোদে শুকাতে হবে।
- ৫/৬ দিন রোদে দিতে হবে এবং ধানের ভিতর চাল শক্ত না হওয়া পর্যন্ত রোদে দিতে হবে।
- মরা বা চিটে ধান আলাদা করতে হবে।
- রোদে শুকনোর পর মুখ বেধে রাখতে হবে যাতে বাতাস বা পোকা না লাগতে পারে।
- কলশি/হাড়ি/প্লাষ্টিক/ভ্রাম এর পাত্র মাচায় উপর রাখতে হবে।
- মাটির হাড়ি/মা-ঠের বাইরের অংশ আলকাতরার প্রলেপ দিতে হবে যাতে বাইরে থেকে জলীয়বাঞ্চি ভিতরে ঢুকতে না পারে।
- বাতাস ঢোকে না এ রকম পলিথিন যুক্ত বস্তার মধ্যে বীজ ধান রাখা যেতে পারে।

খরচঃ ১ বিঘা (৩০ শতক) জমিতে

ক্রঃ	বিবরন	পরিমাণ	হার	টাকা
১	জমি চাষ (প্রস্তুত) করা	৪ বার	২০০	৮০০
২	বীজ ধান ক্রয়	৬ কেজি	১৫	৯০
৫	আগাছা পরিষ্কার	৫জন	১০০	৫০০
৬	ধান কাটা	৪ জন	১০০	৪০০
মোট				১৭৯০/-

আয়ঃ ৮ মন ধানের বাজার মূল্য ৪০০০/- ও পল/খড়ের মূল্য ৯০০/-

নেট লাভঃ ৩১১০/-টাকা।

সুবিধাঃ

- ধান থেকে বাছাই করে বীজ ধান পরবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষন করা যায়।
- নীচু জমি যেখানে ৭/৮ মাস পর্যন্ত পানি থাকে সেখানে অনায়াসে এই ধান জন্মাতে পারে।
- ৫/৭ ফুট পানির উচ্চতায় এই ধান বেড়ে উঠতে পারে।
- রোগ বালাই নেই।
- সার লাগে না।
- জমির উর্বরা শক্তি ঠিক থাকে।
- উচ্চ ফলনশীল ধানের মত অতিরিক্ত পরিচর্যা করা লাগে না।
- চাল খেতে সু-স্বাদু এবং পরিমাণে কম লাগে।

পল/খড়ের ব্যবহারঃ

- দেশী আমন ধানের পল/খড় গরু ভাল খায়।
- জ্বালানী হিসেবে পল/খড় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- নাড়া দিয়ে ঘর ছাওয়া যায়।
- নাড়া ওল, কচু ও পটলের জমিতে মাটির উপর বিছিয়ে দিলে ঘাস উঠতে পারে না।
- পল/খড় ও নাড়ার বাজার মূল্য প্রায় ৮০০/১০০০ টাকা প্রতি হয়ে থাকে।

খ) গাছড়ার মাধ্যমে চাষ পদ্ধতিঃ

ধানের জাত একই হলেও চাষ পদ্ধতি ভিন্ন কিন্তু এই পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন বেশী হয়ে থাকে।

জমির ধরনঃ মধ্যম শ্রেণীর জমি একেবার উচুও না নীচুও না (মধ্যম ঝাড়াটে)।

বীজতলা তৈরী পদ্ধতিঃ

- বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে ১ বিঘা জমিতে গাছড়া লাগানোর জন্য ১ কাঠা পরিমাণ জমিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি দিয়ে জো তৈরী করে ৪ বার চাষ করতে হবে ।
- চাষের শেষে বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে ।
- ৫-৭ দিন পর ঐ ১ কাঠা জায়গায় (বীজতলা) ৫-৬ কেজি শুকনো বীজ ধান ছিটিয়ে দিতে হবে এবং মাটির উপরিভাগ ২ বার চাষ দিয়ে বাসই (মই) দিয়ে সমান করে দিতে হবে ।
- বীজ ধান বোনার ২ মাস পর অর্থাৎ জৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত গাছড়া বড় হতে থাকবে ।
- মাঝে মধ্যে গাছড়ার মধ্যে আগাছা জন্মালে পরিষ্কার করা এবং ছাগল গরুর হাত থেকে রক্ষা করতে হবে ।
- আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে হাটু পর্যন্ত পানি বাধে এরকম ১ বিঘা জমিতে গাছড়া রোপন করার জন্য ২ বার লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে ভাল করে বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে ।
- এরপর ঐ জমিতে বীজতলার গাছড়া তুলে রোপন করতে হবে ।
- সারি থেকে সারি ১ ফুট দূরত্বে ১ গোছ গাছড়া লাগাতে হবে । গোছে ৩/৪ টি গাছড়া লাগাতে হবে ।
- আষাঢ় মাসের প্রথম বৃষ্টি থেকে ৩০ শে আষাঢ় পর্যন্ত জমিতে গাছড়া লাগানো যাবে ।

পরিচর্যাঃ

গাছড়া রোপনের মাস খানেক পর যদি জমিতে আগাছা জন্মে তাহলে হাতবাছা দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে ।

ধান কাটার সময়ঃ

কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে ধান ফোলা শুরু হয় এবং অগ্রহায়ন মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত ধান ফুলতে থাকে । এরপর অগ্রহায়ন মাসের শেষের দিকে ধান পাকা শেষ হয় । পৌষের শুরুতে ধান কাটা শুরু হয় ।

ফলনঃ ১ বিঘাতে ১০/১২ মন ।

বীজ সংরক্ষন পদ্ধতিঃ

- পূর্বের একই পদ্ধতি অনুসরণীয়

খরচঃ খরচ ৪ ১ বিঘা (৩০ শতক) জমিতে

ক্রঃ	বিবরন	পরিমাণ	হার	টাকা
১	বীজতলার জমি চাষ (পর্যন্ত) করা	১ বার	২০০	২০০
২	বীজ ধান ক্রয়	৬ কেজি	১৫	৯০
৩	এক বিঘা জমি চাষ	২ বার	২০০	৪০০
৪	গাছড়া উঠানো ও রোপন জন (শ্রমিক) খরচ	৫	১০০	৫০০
৫	আগাছা পরিষ্কার	১ জন	১০০	১০০
৬	ধান কাটা	৪ জন	১০০	৪০০
মেট				১৬৯০/-

আয়ঃ ১২ মন ধানের বাজার মূল্য ৬০০০/- ও পল/খড়ের মূল্য ৯০০/-

নেট লাভঃ ৫২১০/-টাকা।

সুবিধাঃ

- ধান থেকে বাছাই করে বীজ ধান পরিবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষণ করা যায়।
- ৪/৫ ফুট পর্যন্ত পানির উচ্চতায় এই ধান বেড়ে উঠতে পারে।
- রোগ বালাই নেই।
- সার লাগে না।
- জমির উর্বরা শক্তি ঠিক থাকে।
- উচ্চ ফলনশীল ধানের মত অতিরিক্ত পরিচর্যা করা লাগে না।
- চাল থেতে সু-স্বাদু এবং পরিমাণে কম লাগে।

গ) পাতার মাধ্যমে চাষ পদ্ধতিঃ

ধানের জাত একই হলেও চাষ পদ্ধতি ভিন্ন কিন্তু পাতার মাধ্যমে চাষ করলে ফলন বেশী হয়ে থাকে।

জমির ধরনঃ গাছড়ার ক্ষেত্রে যে ধরনের জমি লাগে পাতার ক্ষেত্রে তার থেকে একটু উচু জমির দরকার।

বীজতলা তৈরী পদ্ধতিঃ

- বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে ১ বিঘা জমিতে পাতা লাগানোর জন্য ১ কাঠা পরিমাণ জমিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি দিয়ে জো তৈরী করে ২/৩ বার চাষ করতে হবে।
- জৈষ্ঠ মাসের বৃষ্টিতে বীজতলা ২ চাষ দিয়ে কাদামাটি করে বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- ৭-৮ কেজি ধান ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং এটা ঝুড়ি/চাঙারী/ধামায় কলাপাতা উপর ধান ঢেলে রাখতে হবে। এরপর বস্তা দিয়ে ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে।

- ধানের কল রের হলে ১ কাঠা পরিমাণ বীজতলাতে বুনতে হবে।
- বীজ ধান ছিটানোর পর খেজুর পাতা দিয়ে ধানের উপর হালকা বাড়ি দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। যাতে ঝড়/বৃষ্টির সময় এক জায়গায় জড়ো না হয়।
- যে সকল জমিতে পাতা লাগাতে হবে। সে সকল জমি ২ চাষ দিতে হবে এবং বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- পাতা তুলে এই চাষ করা ১ বিঘা জমিতে সারি থেকে সারি ১ ফুট অন্তর ১ গোছ লাগাতে হবে। গোছে ৩/৪টি করে পাতা রোপন করতে হবে।
- আষাঢ় মাসের প্রথম বৃষ্টি থেকে ৩০শে আষাঢ় পর্যন্ত পাতা রোপন করা যাবে।

পরিচর্যা:

পাতা লাগানোর পর তেমন কোন পরিচর্যা নেই।

ধান কাটার সময়ঃ

কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে ধান ফোলা শুরু হয় এবং অগ্রহায়ন মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত ধান ফুলতে থাকে। এরপর অগ্রহায়ন মাসের শেষের দিকে ধান পাকা শেষ হয়। পৌষের শুরুতে ধান কাটা শুরু হয়।

ফলনঃ ১ বিঘাতে ৮/১০ মন।

বীজ সংরক্ষন পদ্ধতিঃ

পূর্বের একই পদ্ধতি অনুসরণীয়

খরচঃ ১ বিঘা (৩০ শতক) জমিতে

ক্রঃ	বিবরন	পরিমাণ	হার	টাকা
১	বীজতলার জমি চাষ (প্রস্তুত) করা	১ বার	২০০	২০০
২	বীজ ধান ক্রয়	৬ কেজি	১৫	৯০
৩	এক বিঘা জমি চাষ	২ বার	২০০	৪০০
৪	পাতা উঠানো ও রোপন জন (শ্রমিক) খরচ ৫		১০০	৫০০
৫	ধান কাটা	৪ জন	১০০	৪০০
মোট				১৫৯০/-

আয়ঃ ১০ মন ধানের বাজার মূল্য ৫০০০/- ও পল/খড়ের মূল্য ৮০০/-

নেট লাভঃ ৪২১০/-টাকা।

সুবিধাঃ

- ধান থেকে বাছাই করে বীজ ধান পরবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষন করা যায়।
- ৩/৪ ফুট পর্যন্ত পানির উচ্চতায় এই ধান বেড়ে উঠতে পারে।
- রোগ বালাই নেই।

- সার লাগে না।
- জমির উর্বরা শক্তি ঠিক থাকে।
- উচ্চ ফলনশীল ধানের মত অতিরিক্ত পরিচর্যা করা লাগে না।
- চাল খেতে সু-স্বাদু এবং পরিমানে কম লাগে।

জাতের নাম ৪ মাছরাঙ্গা

রং ৪ খোসা কালচে লাল, আকৃতি-মাঝারী মোটা এবং চাল সাদা।

গন্ধঃ স্বাভাবিক

জমির ধরনঃ মধ্যম জমি যেখানে পানির উচ্চতা ৫/৬ফুট পর্যন্ত হতে পারে ও একটু উচু জমিতে মাছরাঙ্গা ধান নিম্নভোগে পদ্ধতিতে চাষ করা যায়।

চাষ পদ্ধতিঃ

- ক) বোনা (ছিটানো)
- খ) গাছড়া
- গ) পাতা

ক) বোনা (ছিটানো) মাধ্যমে চাষ পদ্ধতিঃ

- চৈত্র মাসের জো বৃষ্টিতে ১ এক বিঘা জমিতে লাঙ্গল দিয়ে ২/৩ বার চাষ দিতে হবে।
- বৈশাখ মাসের প্রথম বৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত চষা জমি ফেলে রাখতে হবে।
- বৈশাখ মাসের জো বৃষ্টিতে বীজ ধান (শুকনো) ঐ জমিতে ছিটিয়ে বুনতে হবে।
- বীজ ধান ছিটানোর পর ঐ জমি দোয়াড় (দুই) চাষ দিতে হবে এবং ৩/৪ বার বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- ১ (এক) দিন পর জমি আবার ৩/৪ বার ভাল করে বাসই (মই) দিতে হবে।
- ১০/১৫ দিন পর চারা গজানোর পর দেখতে হবে যদি ঘন পরিমাণে চারা জন্মায় তাহলে কিছু পাতলা করে দিতে হবে।
- অনেক সময় এই চারা গাছড়া হিসেবে অন্য জমিতে রোপন করা যেতে পারে।

পরিচর্যাঃ

ধানের চারা গজানোর ১/২ মাসের মধ্যে ঝরা/আগাছা মেরে ফেলতে হবে। অনেক সময় পানিতে ভেসে আসা হাওজা (কচুরীপানা) আসলে পরিষ্কার করে দিতে হয়।

ধান কাটার সময়ঃ

কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে ধান ফোলা শুরু হয় এবং অগ্রহায়ন মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত ধান ফুলতে থাকে। এরপর অগ্রহায়ন মাসের শেষের দিকে ধান পাকা শেষ হয়। পৌষের শুরুতে ধান কাটা শুরু হয়।

ফলনঃ ১ বিঘাতে ৭/৮ মন।

বীজ সংরক্ষন পদ্ধতি:

• পূর্বের একই পদ্ধতি অনুসরণীয়
থরচঃ ১ বিঘা (৩০ শতক) জমিতে

ক্রঃ	বিবরন	পরিমাণ	হার	টাকা
১	জমি চাষ (প্রস্তুত) করা	৪ বার	২০০	৮০০
২	বীজ ধান ঝয়	৬ কেজি	১৫	৯০
৫	আগাছা পরিষ্কার	৫জন	১০০	৫০০
৬	ধান কাটা	৪ জন	১০০	৪০০
মোট				১৭৯০/-

আয়ঃ ৮ মন ধানের বাজার মূল্য ৪০০০/- ও পল/খড়ের মূল্য ৮০০/-
নেট লাভঃ ৩০১০/-টাকা।

সুবিধা:

- ধান থেকে বাছাই করে বীজ ধান পরবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষন করা যায়।
- ৫/৬ ফুট পানির উচ্চতায় এই ধান বেড়ে উঠতে পারে।
- রোগ বালাই নেই।
- সার লাগে না।
- জমির উর্বরা শক্তি ঠিক থাকে।
- উচ্চ ফলনশীল ধানের মত অতিরিক্ত পরিচর্যা করা লাগে না।
- চাল খেতে সু-স্বাদু এবং পরিমানে কম লাগে।

খ) গাছড়ার মাধ্যমে চাষ পদ্ধতি:

ধানের জাত একই হলেও চাষ পদ্ধতি ভিন্ন কিন্তু এই পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন বেশী হয়ে থাকে।

জমির ধরন ৪ মধ্যম শ্রেণীর জমি একেবার উচুও না নীচুও না (মধ্যম ঘড়াটে)।

বীজতলা তৈরী পদ্ধতি:

- বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে ১ বিঘা জমিতে গাছড়া লাগানোর জন্য ১ কাঠা পরিমাণ জমিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি দিয়ে জো তৈরী করে ৪ বার চাষ করতে হবে।
- চাষের শেষে বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- ৫-৭ দিন পর ঐ ১ কাঠা জায়গায় (বীজতলা) ৫-৬ কেজি শুকনো বীজ ধান ছিটিয়ে দিতে হবে এবং মাটির উপরিভাগ ২ বার চাষ দিয়ে বাসই (মই) দিয়ে সমান করে দিতে হবে।

- বীজ ধান বোনার ২ মাস পর অর্থাৎ জৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত গাছড়া বড় হতে থাকবে।
- মাঝে মধ্যে গাছড়ার মধ্যে আগাছা জন্মালে পরিষ্কার করা এবং ছাগল গরুর হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।
- আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে হাটু পর্যন্ত পানি বাধে এরকম ১ বিঘা জমিতে গাছড়া রোপন করার জন্য ২ বার লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে ভাল করে বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- এরপর ঐ জমিতে বীজতলার গাছড়া তুলে রোপন করতে হবে।
- সারি থেকে সারি ১ ফুট দূরত্বে ১ গোছ গাছড়া রাগাতে হবে। গোছে ৩/৪ টি গাছড়া লাগাতে হবে।
- আষাঢ় মাসের প্রথম বৃষ্টি থেকে ৩০ শে আষাঢ় পর্যন্ত জমিতে গাছড়া লাগানো যাবে।

পরিচয়ঃ

গাছড়া রোপনের মাস খানেক পর যদি জমিতে আগাছা জন্মে তাহলে হাতবাছা দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

ধান কাটার সময়ঃ

কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে ধান ফোলা শুরু হয় এবং অগ্রহায়ন মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত ধান ফুলতে থাকে। এরপর অগ্রহায়ন মাসের শেষের দিকে ধান পাকা শেষ হয়। পৌষের শুরুতে ধান কাটা শুরু হয়।

ফলনঃ ১ বিঘাতে ৮/৯ মন।

বীজ সংরক্ষন পদ্ধতিঃ

পূর্বের একই পদ্ধতি অনুসরণীয়

খরচঃ ১ বিঘা (৩০ শতক) জমিতে

ক্রঃ	বিবরণ	পরিমাণ	হার	টাকা
১	বীজতলার জমি চাষ (প্রস্তুত) করা	১ বার	২০০	২০০
২	বীজ ধান ক্রয়	৬ কেজি	১৫	৯০
৩	এক বিঘা জমি চাষ	২ বার	২০০	৮০০
৪	গাছড়া উঠানো ও রোপন জন (শ্রমিক) খরচ	৫	১০০	৫০০
৫	আগাছা পরিষ্কার	১ জন	১০০	১০০
৬	ধান কাটা	৮ জন	১০০	৮০০
মোট				১৬৯০/-

আয়ঃ ৯ মন ধানের বাজার মূল্য ৪৫০০/- ও পল/খড়ের মূল্য ৮০০/-

নীট লাভঃ ৩৬১০/-টাকা ।

সুবিধাঃ

- ধান থেকে বাছাই করে বীজ ধান পরিবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষণ করা যায় ।
- ৫/৬ ফুট পর্যন্ত পানির উচ্চতায় এই ধান বেড়ে উঠতে পারে ।
- রোগ বালাই নেই ।
- সার লাগে না ।
- জমির উর্বরা শক্তি ঠিক থাকে ।
- উচ্চ ফলনশীল ধানের মত অতিরিক্ত পরিচর্যা করা লাগে না ।
- চাল খেতে সু-স্বাদু এবং পরিমাণে কম লাগে ।

গ) পাতার মাধ্যমে চাষ পদ্ধতিঃ

ধানের জাত একই হলেও চাষ পদ্ধতি ভিন্ন কিন্তু পাতার মাধ্যমে চাষ করলে ফলন ভাল হয়ে থাকে ।

জমির ধরনঃ গাছড়ার ক্ষেত্রে যে ধরনের জমি লাগে পাতার ক্ষেত্রে তার থেকে একটু উচু জমির দরকার ।

বীজতলা তৈরী পদ্ধতি :

- বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে ১ বিঘা জমিতে পাতা লাগানোর জন্য ১ কাঠা পরিমাণ জমিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি দিয়ে জো তৈরী করে ২/৩ বার চাষ করতে হবে ।
- জৈষ্ঠ মাসের বৃষ্টিতে বীজতলা ২ চাষ দিয়ে কাদামাটি করে বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে ।
- ৭-৮ কেজি ধান ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং এটা ঝুড়ি/চাঙারী/ধামায় কলাপাতা উপর ধান ঢেলে রাখতে হবে । এরপর বস্তা দিয়ে ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে ।
- ধানের কল রের হলে ১ কাঠা পরিমাণ বীজতলাতে হাঁচা বুনতে হবে ।
- বীজ ধান ছিটানোর পর খেজুর পাতা দিয়ে ধানের উপর হালকা বাড়ি দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে । যাতে ঝড়/বৃষ্টির সময় এক জায়গায় জড় না হয় ।
- যে সকল জমিতে পাতা লাগাতে হবে । সে সকল জমি ২ চাষ দিতে হবে এবং বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে ।
- পাতা তুলে ঐ চাষ করা ১ বিঘা জমিতে সারি থেকে সারি ১ ফুট অন্তর ১ গোছ লাগাতে হবে । গোছে ৩/৪টি করে পাতা রোপন করতে হবে ।

- আষাঢ় মাসের প্রথম বৃষ্টি থেকে ৩০শে আষাঢ় পর্যন্ত পাতা রোপন করা যাবে।

পরিচর্যাঃ

পাতা লাগানোর পর তেমন কোন পরিচর্যা নেই।

ধান কাটার সময়ঃ

কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে ধান ফোলা শুরু হয় এবং অগ্রহায়ন মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত ধান ফুলতে থাকে। এরপর অগ্রহায়ন মাসের শেষের দিকে ধান পাকা শেষ হয়। পৌষের শুরুতে ধান কাটা শুরু হয়।

ফলনঃ ১ বিঘাতে ৭/৮ মন।

বীজ সংরক্ষন পদ্ধতিঃ

- পূর্বের একই পদ্ধতি অনুসরণীয়

খরচঃ ১ বিঘা (৩০ শতক) জমিতে

ক্রঃ	বিবরণ	পরিমাণ	হার	টাকা
১	বীজতলার জমি চাষ (প্রস্তুত) করা	১ বার	২০০	২০০
২	বীজ ধান ক্রয়	৬ কেজি	১৫	৯০
৩	এক বিঘা জমি চাষ	২ বার	২০০	৪০০
৪	পাতা উঠানো ও রোপন জন (শ্রমিক) খরচ	৫	১০০	৫০০
৫	ধান কাটা	৪ জন	১০০	৪০০
মোট				১৫৯০/-

আয়ঃ ৮ মন ধানের বাজার মূল্য ৪০০০/- ও পল/খড়ের মূল্য ৮০০/-

নেট লাভঃ ৩২১০/-টাকা।

সুবিধাঃ

- ধান থেকে বাছাই করে বীজ ধান পরবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষন করা যায়।
- ৩/৪ ফুট পর্যন্ত পানির উচ্চতায় এই ধান বেড়ে উঠতে পারে।
- রোগ বালাই নেই।
- সার লাগে না।
- জমির উর্বরা শক্তি ঠিক থাকে।
- উচ্চ ফলনশীল ধানের মত অতিরিক্ত পরিচর্যা করা লাগে না।
- চাল খেতে সু-স্বাদু এবং পরিমাণে কম লাগে।

জাতের নামঃ গঁজাজল

রং খোসা ঘিয়ে, আকৃতি-মাঝারী মোটা এবং চাল সাদা।

গঁজঃ স্বাভাবিক

জমির ধরনঃ মধ্যম জমি যেখানে পানির উচ্চতা ৫/৬ফুট পর্যন্ত হতে পারে ও একটু উচু জমিতে গঁজাজল ধান নিম্নজো পদ্ধতিতে চাষ করা যায়।

চাষ পদ্ধতি:

- ক) বোনা (ছিটানো)
- খ) গাছড়া
- গ) পাতা

ক) বোনা (ছিটানোর) মাধ্যমে চাষ পদ্ধতি:

- চৈত্র মাসের জো বৃষ্টিতে ১ এক বিঘা জমিতে লাঙ্গল দিয়ে ২/৩ বার চাষ দিতে হবে।
- বৈশাখ মাসের প্রথম বৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত চাষ জমি ফেলে রাখতে হবে।
- বৈশাখ মাসের জো বৃষ্টিতে বীজ ধান (শুকনো) ঐ জমিতে ছিটিয়ে বুনতে হবে।
- বীজ ধান ছিটানোর পর ঐ জমি দোয়াড় (দুই) চাষ দিতে হবে এবং ৩/৪ বার বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- ১ (এক) দিন পর জমি আবার ৩/৪ বার ভাল করে বাসই (মই) দিতে হবে।
- ১০/১৫ দিন পর চারা গজানোর পর দেখতে হবে যদি ঘন পরিমাণে চারা জন্মায় তাহলে কিছু পাতলা করে দিতে হবে।
- অনেক সময় এই চারা গাছড়া হিসেবে অন্য জমিতে রোপন করা যেতে পারে।

পরিচর্যা:

ধানের চারা গজানোর ১/২ মাসের মধ্যে ঝরা/আগাছা মেরে ফেলতে হবে। অনেক সময় পানিতে ভেসে আসা হাওজা (কচুরীপানা) আসলে পরিষ্কার করে দিতে হয়।

ধান কাটার সময়:

কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে ধান ফোলা শুরু হয় এবং অগ্রহায়ন মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত ধান ফুলতে থাকে। এরপর অগ্রহায়ন মাসের শেষের দিকে ধান পাকা শেষ হয়। পৌষের শুরুতে ধান কাটা শুরু হয়।

ফলনঃ ১ বিঘাতে ৭/৮ মন।

বীজ সংরক্ষন পদ্ধতি:

- পূর্বের একই পদ্ধতি অনুসরণীয়

খরচঃ ১ বিঘা (৩০ শতক) জমিতে

ক্রঃ	বিবরণ	পরিমাণ	হার	টাকা
১	জমি চাষ (প্রস্তুত) করা	৪ বার	২০০	৮০০
২	বীজ ধান ক্রয়	৬ কেজি	১৫	৯০
৫	আগাছা পরিষ্কার	৫জন	১০০	৫০০
৬	ধান কাটা	৪ জন	১০০	৪০০
মোট				১৭৯০/-

আয়ঃ ৮ মন ধানের বাজার মূল্য ৪০০০/- ও পল/খড়ের মূল্য ৮০০/-

নেট লাভঃ ৩০১০/-টাকা।

সুবিধাঃ

- ধান থেকে বাছাই করে বীজ ধান পরবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষন করা যায়।
- ৫/৬ ফুট পানির উচ্চতায় এই ধান বেড়ে উঠতে পারে।
- রোগ বালাই নেই।
- সার লাগে না।
- জমির উর্বরা শক্তি ঠিক থাকে।
- উচ্চ ফলনশীল ধানের মত অতিরিক্ত পরিচর্যা করা লাগে না।
- চাল থেতে সু-স্বাদু এবং পরিমানে কম লাগে।

খ) গাছড়ার মাধ্যমে চাষ পদ্ধতিঃ

ধানের জাত একই হলেও চাষ পদ্ধতি ভিন্ন কিন্তু এই পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন বেশী হয়ে থাকে।

জমির ধরনঃ মধ্যম শ্রেণীর জমি একেবার উচুও না নীচুও না (মধ্যম বাড়াটে)।

বীজতলা তৈরী পদ্ধতিঃ

- বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে ১ বিঘা জমিতে গাছড়া লাগানোর জন্য ১ কাঠা পরিমাণ জমিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি দিয়ে জো তৈরী করে ৪ বার চাষ করতে হবে।
- চাষের শেষে বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- ৫-৭ দিন পর ঐ ১ কাঠা জায়গায় (বীজতলা) ৫-৬-কেজি শুকনো বীজ ধান ছিটিয়ে দিতে হবে এবং মাটির উপরিভাগ ২ বার চাষ দিয়ে বাসই (মই) দিয়ে সমান করে দিতে হবে।
- বীজ ধান বোনার ২ মাস পর অর্থাৎ জৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত গাছড়া বড় হতে থাকবে।
- মাঝে মধ্যে গাছড়ার মধ্যে আগাছা জন্মালে পরিষ্কার করা এবং ছাগল গরুর হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

- আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে হাটু পর্যন্ত পানি বাধে এরকম ১ বিঘা জমিতে গাছড়া রোপন করার জন্য ২ বার লাঙল দিয়ে চাষ করে ভাল করে বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- এরপর ঐ জমিতে বীজতলার গাছড়া তুলে রোপন করতে হবে।
- সারি থেকে সারি ১ ফুট দূরত্বে ১ গোছ গাছড়া রাগাতে হবে। গোছে ৩/৪ টি গাছড়া লাগাতে হবে।
- আষাঢ় মাসের প্রথম বৃষ্টি থেকে ৩০ শে আষাঢ় পর্যন্ত জমিতে গাছড়া লাগানো যাবে।

পরিচর্যাঃ

গাছড়া রোপনের মাস খানেক পর যদি জমিতে আগাছা জন্মে তাহলে হাতবাছা দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

ধান কাটার সময়ঃ

কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে ধান ফোলা শুরু হয় এবং অগ্রহায়ন মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত ধান ফুলতে থাকে। এরপর অগ্রহায়ন মাসের শেষের দিকে ধান পাকা শেষ হয়। পৌষের শুরুতে ধান কাটা শুরু হয়।

ফলনঃ ১ বিঘাতে ৮/৯ মন।

বীজ সংরক্ষন পদ্ধতিঃ

পূর্বের একই পদ্ধতি অনুসরণীয়

খরচঃ ১ বিঘা (৩০ শতক) জমিতে

ক্রঃ	বিবরন	পরিমাণ	হার	টাকা
১	বীজতলার জমি চাষ (প্রস্তুত) করা	১ বার	২০০	২০০
২	বীজ ধান ক্রয়	৬ কেজি	১৫	৯০
৩	এক বিঘা জমি চাষ	২ বার	২০০	৪০০
৪	গাছড়া উঠানো ও রোপন জন (শ্রমিক) খরচ	৫	১০০	৫০০
৫	আগাছা পরিষ্কার	১ জন	১০০	১০০
৬	ধান কাটা	৮ জন	১০০	৮০০
মোট				১৬৯০/-

আয়ঃ ৯ মন ধানের বাজার মূল্য ৪৫০০/- ও পল/খড়ের মূল্য ৮০০/-
নেট লাভ ৪ ৩৬১০/-টাকা।

সুবিধা ৪

- ধান থেকে বাছাই করে বীজ ধান পরিবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষন করা যায়।
- ৫/৬ ফুট পর্যন্ত পানির উচ্চতায় এই ধান বেড়ে উঠতে পারে।

- রোগ বালাই নেই।
- সার লাগে না।
- জমির উর্বরা শক্তি ঠিক থাকে।
- উচ্চ ফলনশীল ধানের মত অতিরিক্ত পরিচর্যা করা লাগে না।
- চাল থেতে সু-স্বাদু এবং পরিমাণে কম লাগে।

গ) পাতার মাধ্যমে চাষ পদ্ধতিঃ

ধানের জাত একই হলেও চাষ পদ্ধতি ভিন্ন কিন্তু পাতার মাধ্যমে চাষ করলে ফলন ভাল হয়ে থাকে।

জমির ধরন ৪ গাছড়ার ক্ষেত্রে যে ধরনের জমি লাগে পাতার ক্ষেত্রে তার থেকে একটু উচু জমির দরকার।

বীজতলা তৈরী পদ্ধতিঃ

- বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে ১ বিঘা জমিতে পাতা লাগানোর জন্য ১ কাঠা পরিমাণ জমিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি দিয়ে জো তৈরী করে ২/৩ বার চাষ করতে হবে।
- জৈষ্ঠ মাসের বৃষ্টিতে বীজতলা ২ চাষ দিয়ে কাদামাটি করে বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- ৭-৮ কেজি ধান ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং এটা ঝুঁড়ি/চাঙারী/ধামায় কলাপাতা উপর ধান ঢেলে রাখতে হবে। এরপর বস্তা দিয়ে ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে।
- ধানের কল রের হলে ১ কাঠা পরিমাণ বীজতলাতে হাঁটা বুনতে হবে।
- বীজ ধান ছিটানোর পর খেজুর পাতা দিয়ে ধানের উপর হালকা বাড়ি দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। যাতে ঝড়/বৃষ্টির সময় এক জায়গায় জড় না হয়।
- যে সকল জমিতে পাতা লাগাতে হবে। সে সকল জমি ২ চাষ দিতে হবে এবং বাসই (মই) দিয়ে সমান করতে হবে।
- পাতা তুলে ঐ চাষ করা ১ বিঘা জমিতে সারি থেকে সারি ১ ফুট অন্তর ১ গোছ লাগাতে হবে। গোছে ৩/৪টি করে পাতা রোপন করতে হবে।
- আষাঢ় মাসের প্রথম বৃষ্টি থেকে ৩০শে আষাঢ় পর্যন্ত পাতা রোপন করা যাবে।

পরিচর্যাঃ

পাতা লাগানোর পর তেমন কোন পরিচর্যা নেই।

ধান কাটার সময় ৪

কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে ধান ফোলা শুরু হয় এবং অগ্রহায়ন মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত ধান ফুলতে থাকে। এরপর অগ্রহায়ন মাসের শেষের দিকে ধান পাকা শেষ হয়। পৌষের শুরুতে ধান কাটা শুরু হয়।

ফলনঃ ১ বিঘাতে ৭/৮ মন।

বীজ সংরক্ষন পদ্ধতি:

- পূর্বের একই পদ্ধতি অনুসরণীয়

খরচঃ ১ বিঘা (৩০ শতক) জমিতে

ক্রঃ	বিবরণ	পরিমাণ	হার	টাকা
১	বীজতলার জমি চাষ (প্রস্তুত) করা	১ বার	২০০	২০০
২	বীজ ধান ক্রয়	৬ কেজি	১৫	৯০
৩	এক বিঘা জমি চাষ	২ বার	২০০	৪০০
৪	পাতা উঠানো ও রোপন জন (শ্রমিক) খরচ	৫	১০০	৫০০
৫	ধান কাটা	৪ জন	১০০	৪০০
মোট				১৫৯০/-

আয়ঃ ৮ মন ধানের বাজার মূল্য ৪০০০/- ও পল/খড়ের মূল্য ৮০০/-

নেট লাভঃ ৩২১০/-টাকা।

সুবিধাঃ

- ধান থেকে বাছাই করে বীজ ধান পরিবর্তী বছরের জন্য সংরক্ষন করা যায়।
- ৩/৪ ফুট পর্যন্ত পানির উচ্চতায় এই ধান বেড়ে উঠতে পারে।
- রোগ বালাই নেই।
- সার লাগে না।
- জমির উর্বরা শক্তি ঠিক থাকে।
- উচ্চ ফলনশীল ধানের মত অতিরিক্ত পরিচর্যা করা লাগে না।
- চাল থেকে সু-স্বাদু এবং পরিমাণে কম লাগে।

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে খাদ্য উৎপাদন বৃক্ষের সম্ভাবনা

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উচ্চ ফলনশীল ধানের প্রচলন ও বাঁধ নির্মাণের প্রেক্ষিতে খাদ্য উৎপাদনের যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা কোন স্থায়ী সমস্যা নয়। তবে ধীরে ধীরে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এই সমস্যা দূর করা সম্ভব এবং যদি তাৎক্ষনিকভাবে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তাহলে খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বি঱াট পরিবর্তন আনা সম্ভব। যেমন-

মিষ্টি পানি নির্ভরশীল:

মিষ্টি পানি নির্ভরশীল যে সকল নিচু জলাভূমি (গভীর বিল) আমন মৌসুমে অব্যবহৃত থাকে বা ফসল উৎপাদিত হয় না সেখানে দেশীয় প্রজাতি যথা-হরিশঙ্ক, মাছরাঙা, ব্যাত, গঙ্গাজল প্রভৃতি জাতের ধানের প্রচলন ঘটানো সম্ভব। তবে যেহেতু এসকল জমিতে বোরো মৌসুমে কৃষকেরা উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ করে থাকে তাই কৃষকেরা বোনা আমন ধানের পরিবর্তে রোপা

আমন ধানের চাষ করতে পারে। মূলতঃ দেশী প্রজাতির আমন ধান আষাঢ়/শ্রাবণ মাসে রোপন করা হয়ে থাকে। সাধারণত এই সকল দেশী প্রজাতির ধানের উৎপাদন বিঘা প্রতি ১০-১৪ মণ। তাছাড়া এই সমস্ত নিচু জলা ভূমিতে চাষ উপযোগী কোন উচ্চ ফলনশীল আমন ধানের প্রজাতির উদ্ভাবন ঘটেনি। সেহেতু দেশী প্রজাতির ধান লাগানোর বিকল্প নেই। সাধারণতঃ এসব ধান উৎপাদন খচ খুবই কম।

দেশী জাতের আমন ধান রক্ষার জন্য করণীয়:

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অনুসারে মিষ্টি পানি নির্ভরশীল যে সকল নীচু জলাভূমি সেখানে চিংড়ি চাষ বন্ধ করে দেশী আমন ধানের চাষ করা সম্ভব। উচ্চফলনশীল জাতের আমন ধান চাষের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগের কারণে একদিকে যেমন জমির উর্বরা শক্তি নষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে জলাভূমি থেকে দেশী প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হচ্ছে ফলে ব্যাপকভাবে মানুষের আমিষের চাহিদায় ঘাটতি হচ্ছে। তাই এই মুহূর্তে জরুরীভাবে-

- গভীর জলাভূমিতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে চিংড়ি, সাদা মাছের চাষ কমিয়ে ফেলতে হবে।
- জোয়ারভাটা প্রবাহমান রাখার জন্য সকল খালের ইঁজারা বন্ধ করে খালগুলো উন্মুক্ত করতে হবে।
- জমিতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈবসার ব্যবহার বাঢ়াতে হবে।
- স্থানীয় ভাবে উপযোগী দেশী জাতের বীজ ধান চাষ করতে হবে।
- নারীর বীজ সংরক্ষণের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- গ্রামে গ্রামে কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে কৃষি বাজেটের সকল ভর্তুকি/ন্যায্য হিস্যা আদায় করে নিতে হবে।
- দেশী জাতের আমন ধানের প্রসারের জন্য কৃষকদের চাষাবাদ সম্পর্কে উদ্বৃদ্ধ কারার জন্য প্রদর্শনী প্ল্যাটের ব্যবস্থা করতে হবে।
- উচ্চফলনশীল জাতের ধান চাষ বিস্তার সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে।

উপসংহারণ

বাংলাদেশে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে যদিও উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তবুও ঈষৎ লবণ-পানি নির্ভরশীল উপকূলীয় জলাভূমি, মিটি পানি নির্ভরশীল নীচু জলাভূমি উপযোগী কোন উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া আউশ মৌসুমে যদিও উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান উদ্ভাবিত হয়েছে কিন্তু তা কৃষকদের যথেষ্ট পরিমাণে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাই যদি এসব অব্যবহৃত বা চিংড়ি চাষ এলাকার কয়েক লাখ একর জমিতে দেশীয় প্রজাতির ধানের প্রচলন ঘটানো যায়, তাহলে ব্যাপক খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলা করা সম্ভব ও কৃষি শ্রমিকদের কর্ম-সংস্থান করা সম্ভব। তদুপরি দেশীয় প্রজাতির এসকল ধানের বীজ কৃষকেরা বাড়িতে নিজেরাই শুণগত মান বজায় রেখে সংরক্ষণ করতে পারে।

তালা ও তেতুলিয়া ইউনিয়নের নিচু জমি যেখানে বর্ষা মওসুমে বেশী পানি থাকে সে সকল জমিতে হরিশঙ্ক, মাছরাঙা, গঙ্গাজল জাতের দেশী আমন ধান চাষ করে অধিক পরিমাণ লাভ করা যায়। মানুষের অবিবেচনা প্রসূত কর্মকাণ্ডের ফলে হারিয়ে যেতে বসেছে দেশী আমন ধান এবং যুক্ত হয়েছে চিংড়ী চাষের ঘের ও উচ্চফলনশীল জাতের আমন ধানের চাষ। তাই আমাদের সকলের সম্মিলিত উদ্যোগে ব্যাপক প্রচারনা ও জরুরী পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে হাজার বছরের সেই দেশী আমন ধানের চাষ ফিরিয়ে এনে এ এলাকার কৃষকদের মুখে আবারও হাসি ফিরিয়ে আনতে হবে। উচ্চফলনশীল জাতের আমন ধান চাষের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে আমাদের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষা করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহি দেশীয় জাতের আমন ধান চাষ ও বীজ ধানের পুনরুদ্ধার করে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এই অঞ্চলের দায়িত্ব বিমোচন করা সম্ভব।



উত্তরণ

৪২, সাত মসজিদ রোড (৪র্থ তলা)

ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

ফোন : +৮৮-০২-৯১২২৩০২

E-mail : uttaran@bdonline.com

website : <http://uttaran.org>